ইউনিট-৭

দিল্লি সালতানাত

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় নিয়ে এই ইউনিট।
কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় করেছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশ। ইলতুৎমিশের কন্যা রাজিয়া ছিলেন একমাত্র মহিলা যিনি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।
সুলতান রাজিয়ার পর দিল্লির মুসলিম শাসনের অবনতি রোধ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে।
উপর্যুক্ত চার সুলতানের শাসনকালই এই ইউনিটের চারটি পাঠের বিষয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. কুতুবউদ্দিন আইবক
- পাঠ-২. সুলতান ইলতুৎমিশ
- পাঠ-৩. সুলতান রাজিয়া
- পাঠ-৪. গিয়াসউদ্দিন বলবন

পাঠ - ১

কুতুবউদ্দিন আইবক

উদ্দেশ্য ঃ

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- দিলি সুলতানি প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বের সুলতানদের সম্বন্ধে ধারণা পাবেন ;
- কুতুবউদ্দিন আইবকের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- কুতুবউদ্দিনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

প্রথম পর্বের তুর্কি সুলতান

ভারতে মুহাম্মদ ঘোরীর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর প্রধান অনুচর ও সহকর্মী কুতুবউদ্দিন আইবক। কুতুবউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সাধারণভাবে 'দাসবংশ' নামে পরিচিত - যদিও এই নামকরণের পিছনে তেমন কোনো যুক্তি নেই। কেননা, ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লিতে তিনটি পৃথক রাজবংশের কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিশ এবং বলবন রাজত্ব করেন।এদের কেউই সিংহাসনারোহণের সময় ক্রীতদাস ছিলেন না।তাছাড়া সকলেই নিয়মানুগভাবে 'দাসত্ব' থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।এমন কি অনেকেই রাজপরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। যাহোক কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে শুরু করে পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত যাঁরা ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন তাঁদেরকে পাঠান, দাস, আদি তুর্কি সুলতান, তুর্কি মামলুক, ইলবারি তুর্কি ইত্যাদি নামে অভিহিত না করে 'দিল্লি সুলতানি প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বের তুর্কি সুলতান' হিসাবে আখ্যা দেয়াই যুক্তিযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। সুতরাং কুতুবউদ্দিনকে 'দাস' সুলতান হিসাবে বর্ণনা করার পিছনে শক্তিশালী ঐতিহাসিক যুক্তি নেই। কেননা তিনি মুহাম্মদ ঘোরীর কাছ থেকে 'মুক্তি সনদ' লাভ করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই কুতুবউদ্দিন ও পরবর্তী শাসকদেরকে 'মামলুক সুলতান' হিসাবেও অনেকে আখ্যা দিতে চান। আরবি শব্দ 'মামলুক'-এর অর্থ হলো 'স্বীয় অধিকারভুক্ত'।

প্রথম জীবন ও সিংহাসনারোহণ

তুর্কিস্থানের এক 'আইবক' উপজাতি পরিবারে কুতুবউদ্দিনের জন্ম হয়। বাল্যকালেই ক্রীতদাসরূপে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। প্রথমে নিশাপুরের কাজি ফকরুদ্দিন আবদুল আজিজ কুফী তাঁকে কিনেন এবং কাজির নিকটে থাকা অবস্থাতেই কুতুবউদ্দিন বিদ্যাশিক্ষা করেন। অশ্বারোহণ এবং তীরন্দাজিতে তিনি বিশেষভাবে পটু হন। কাজির মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিনকে মুহাম্মদ ঘোরীর কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। সমসাময়িক উৎস হতে জানা যায় কুতুব দেখতে কুৎসিত হলেও গুণবিচারে তিনি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিলেন। তাঁর অধ্যাবসায়, সাহসিকতা, প্রভুভক্তি, সেবা ও বদান্যতায় ঘোরী মুগ্ধ হন। তিনি কুতুবউদ্দিনকে সৈন্যবাহিনীর এক শাখার অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। এভাবে 'আমীর-ই-আখুর' বা সুলতানের 'অশ্বশালার অধিপতি' হিসাবে কুতুবউদ্দিন সর্বপ্রথম তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। মুহাম্মদ ঘোরীর যুদ্ধাভিযানসমুহে কুতুবউদ্দিন বিশেষভাবে সাহায্য করেন এবং ভারত বিজয়কালে বিচক্ষণ সমর নায়করূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। উত্তর ভারত বিজয়ের পর সঙ্গত কারণেই কুতুবউদ্দিন বিজিত রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হন। ১১৯২ হতে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মীরাট, দিল্লি, রণথম্ভোর, বারাণসী; ১১৯৭-৯৮ খিস্টাব্দে কনৌজ, কালিঞ্জর দখলে ভূমিকা রাখেন। এভাবে কুতুবউদ্দিন উত্তরোত্তর বিজয় লাভ করে মুহাম্মদ ঘোরীর ভারতীয় রাজ্যের শ্রী ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। মুহাম্মদ ঘোরী যখন মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে ব্যস্ত, তখন কুতুবউদ্দিন একান্ত অনুগত প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে ঘোর রাজ্য রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম অধিকারের সীমানাও বৃদ্ধি করে যান।

১২০৬ খিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরীর আকস্মিক মৃত্যু হলে কুতুবউদ্দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশ্য এরই মধ্যে তিনি স্বীয় শক্তির স্থায়িত্বের জন্য সমসাময়িক রীতি অনুসারে উপযুক্ত বৈবাহিকসূত্রের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে মুহাম্মদ ঘোরীর এক সেনাপতি তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। নিজের ভগ্নীকে মুহাম্মদ ঘোরীর অপর এক সেনাপতি নাসিরউদ্দিন কুবাচার সঙ্গে বিয়ে দেন। তাঁর এক কন্যাকে বিয়ে দেন তাঁরই সুযোগ্য ক্রীতদাস ইলতুৎমিশের সঙ্গে।

রাজ্যশাসন

কুতুবউদ্দিন মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। ১২০৮ খিস্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে মুহাম্মদ ঘোরীর উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ কর্তৃক তিনি 'সুলতান' উপাধিতে ভূষিত হন। রাজ্যশাসনের চার বছরের মধ্যে তিনি নতুন কোনো রাজ্য জয় করেননি। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও তেমন নতুন কিছু অর্জিত হয়নি। তবে ঘোরীর সেনাপতি থাকাকালেই তিনি কতিপয় অনধিকৃত অঞ্চল অধিকার করেন এবং কতিপয় বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করেন। ফলে বিজিত অঞ্চলে মুসলমান শাসন স্থায়ী হওয়ার পথ সুগম হয়। সুলতান হবার পর কুতুবউদ্দিন কেবল বাংলার মুসলমান রাজধানী লখনৌতি স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনেন। কুতুবউদ্দিন একটি বিরাট এলাকা শাসনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন- তাঁর রাজ্য পশ্চিমে লাহোর হতে পূর্বে বাংলা এবং উত্তরে দিল্লি হতে দক্ষিণে গুজরাট ও কালিঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মাত্র চার বছরের শাসনকালে কুতুবউদ্দিনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ। যে কারণে তিনি এ সময় নতুন কোনো রাজ্য জয় না করে সাম্রাজ্যের সমস্যা-সংকটের দিকেই বেশি মনোযোগ দেন। এ কাজে তাঁর সাফল্য নির্ভর করছিল তাঁর ওপর তুর্কি অভিজাতদের আস্থা ও বিশ্বস্ততা স্থাপনের ওপর।কিন্তু সে কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করার আগেই ১২১০ খিস্টাব্দে (মতান্তরে ১২১২ খিস্টাব্দে) কুতুবউদ্দিন মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য বাংলা বিহারে কুতুবউদ্দিন কিছুটা সাফল্য প্রদর্শন করেছিলেন। বখতিয়ার খলজীর পর আলী মর্দান খলজী বাংলার ক্ষমতায় আরোহণ করেন। কিন্তু আলী মর্দানের বিরোধী খলজী মালিক মুহাম্মদ শিরান খলজী তাঁকে পদচ্যুত ও বন্দি করেন। আলী মর্দান কুতুবউদ্দিনের দ্বারস্থ হন। কুতুবউদ্দিন অযোধ্যার শাসকের সাহায্যে আলী মর্দানকে বাংলার শাসন– কর্তৃত্বে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন।

কৃতিত্বের মূল্যায়ন

কুতুবউদ্দিন আইবককে তুর্কি অধিকৃত ভারতের সর্বপ্রথম সার্বভৌম নৃপতি বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এ জাতীয় কোনো মুদ্রা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ইবনে বতুতা কুতুবউদ্দিনকে ভারতের প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসাবে স্বীকার করেননি। তবে এ কথাটি অস্বীকার করা চলে না যে, কুতুবউদ্দিনই গজনীর সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে ভারতভূমিকে মুক্ত করে স্বাধীন সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। মুহাম্মদ ঘোরীর সহকর্মী হিসাবে তিনি যেমন রণক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করেন, তেমনি ঘোর অধিকৃত ভারত-ভুখন্ডের উপ-শাসক হিসাবেও যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কুতুবউদ্দিন একজন অনুগত শাসক, নিষ্ঠাবান সমরকুশলী সৈনিক হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আধা-স্বাধীন শাসনের সূচনা করেন। অত:পর দাসত্বমুক্ত হয়ে বৈধভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসন পরিচালনা করেন। যাহোক প্রথম পর্বে কুতুবউদ্দিন আইবক ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা, দ্বিতীয় পর্বে তিনি একজন কূটনীতিক এবং শেষ পর্বে তিনি ছিলেন নতুন এক সম্রাজ্যের সংগঠক। ডঃ এস. আর. শর্মা কুতুবউদ্দিনের অবদানকে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপয়িতা বাবরের অবদানের সাথে তুলনা করেন। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে ভারতে 'মুসলিম বিজয়ের অন্যতম পথিকৃৎ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।বস্তুত সামান্য ক্রীতদাস থেকে ভারতের অধীশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হবার অনন্য কৃতিত্বে কুতুবউদ্দিন আলোকিত। তাঁর কোনো রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না, দেশে বিদেশে শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরও কোনো অভাব ছিল না। তথাপি কোনোরকম বিচলিত না হয়ে তিনি স্বাধীন শাসন কায়েম করেন। মধ্যযুগের লেখক হাসান নিজামি কুতুবের ন্যায়পরায়ণতা ও কর্তব্যবোধের

প্রশংসা করেছেন। দানশীলতার জন্য তিনি 'লাখবক্স' বা লক্ষদাতার খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লি ও আজমিরে তিনি 'কুয়াত-উল- ইসলাম' এবং 'আড়হাই-দিন-কা ঝোপড়া' নামে দুটি মসজিদও নির্মাণ করেন। বিখ্যাত কুতুব মিনারের নির্মাণকাজ তাঁর আমলেই শুরু হয়েছিল। ড. এ. বি. এম. ঘাবিবুল্লাহ কুতুবউদ্দিনের চরিত্রে তুর্কি ও পারসিক ধারার সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে করেন। বস্তুত, তুর্কি জাতির নির্ভীকতা এবং পারসিকদের উদারতার সমন্বয়ে কুতুবউদ্দিন যে শক্তি ও মনের অধিকারী হয়েছিলেন তা তাঁকে ভারতবর্ষে নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন কাজে যথাযথভাবে পরিচালিত করেছিল। তবে কুতুবউদ্দিন সম্পর্কে নানা ধরনের বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তিনি আদৌ স্বাধীন শাসক ছিলেন কিনা সে প্রশ্নও কেউ কেউ তুলে থাকেন। তাঁকে দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আখ্যা দেবার ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকগণ একমত নন। তবে একথাটি স্বীকার করতেই হবে, ভারতে বহির্দেশীয় প্রভাব থেকে মুক্ত স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার পথ কুতুবউদ্দিনই প্রশস্ত করে গিয়েছেন। এই বিচারে দিল্লির মুসলিম রাজ্যের প্রধান স্থপতি বলা যায় কুতুবউদ্দিন আইবককে।

সারসংক্ষেপ

দিল্লি সুলতানি প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বের তুর্কি সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক ১২০৬ খিস্টাব্দ থেকে ১২১০ খ্রিস্টাব্দ (মতান্তর ১২১২খ্রি:) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কুতুবউদ্দিনের জীবন শুরু হয় ক্রীতদাস হিসেবে। দেখতে কুৎসিত হলেও গুণবিচারে তিনি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিলেন। কুতুবউদ্দিনের রাজ্য পশ্চিমে লাহোর হতে পূর্বে বাংলা এবংউত্তরে দিল্লি হতে দক্ষিণে গুজরাট ও কালিঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত কুতুবউদ্দিনই গজনীর সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে ভারতভূমিকে মুক্ত করে স্বাধীন সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন। তাই তাঁকেই দিল্লি সালতানাতের প্রধান স্থপতি হিসেবে অনেকেই আখ্যা দেন।এ কথাটি একান্তই সত্য যে, সামান্যক্রীতদাস থেকে ভারতের অধীশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হবার অনন্য কৃতিত্বে কুতুবউদ্দিন আলোকিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন

১। কুতুবউদ্দিন সর্বপ্রথম তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন
   (ক) 'অশ্বশালার অধিপতি' হিসাবে (খ) গোলন্দাজ প্রধান হিসেবে
   (গ) প্রধান সেনাপতি হিসেবে (ঘ) তীরন্দাজ বাহিনী প্রধান হিসেবে।

২। কুতুবউদ্দিন কোন শাসককে বাংলার সিংহাসনে পুন:স্থাপন করেন?
   (ক) শীরান খলজীকে (খ) ইওয়াজ খলজীকে
   (গ) আলী মর্দান খলজীকে (ঘ) বখতিয়ার খলজীকে।

৩। কুতুবউদ্দিন ভারতের প্রথম স্বাধীন সুলতান নন– মন্তব্যটি কার?
   (ক) মা-হুয়ান (খ) বারবোসা
   (গ) ইবনে বতুতা (ঘ) মিনহাজ-উস-সিরাজ।

৪। কুতুবের চরিত্রে তুর্কি ও পারসিক ধারার সমন্বয় ঘটেছে– মন্তব্যটি কার?
   (ক) ড. ঈশ্বরী প্রসাদ (খ) ড. এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ
   (গ) ড. আবদুল করিম (ঘ) ড. এস.আর. শর্মা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কুতুবউদ্দিন আইবক সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। কুতুবউদ্দিনকে 'দাস সুলতান' আখ্যাদানের যৌক্তিকতা আছে কি? তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। কুতুবউদ্দিন আইবককে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় কি?

৩। কুতুবউদ্দিনের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান নিরূপন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India.*

২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

৩। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*

৪। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারতের ইতিহাস*, ২য় খন্ড।

পাঠ - ২

সুলতান ইলতুৎমিশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সিংহাসনারোহণের ক্ষেত্রে ইলতুৎমিশের সমস্যাসমূহ ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- ইলতুৎমিশের সামরিক কৃতিত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ;
- ইলতুৎমিশের সামগ্রিক কৃতিত্ব ও সাফল্য মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন ইলবারি তুর্কি গোষ্ঠীভূত। তাঁর আমল থেকেই দিল্লিতে ইলবারি শাসন শুরু হয়। প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানা যায় যে, ইলতুৎমিশ বাল্যকাল থেকেই দেহ-সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। সচ্ছল পরিবারে জন্ম হলেও ঈর্ষান্বিত ভাইয়েরা তাঁকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেন।একজন দাস বিক্রেতা বোখারার সম্ভ্রান্ত সদর-ই-জাহানের কাছে তাঁকে বিক্রি করেন।এই পরিবারে থাকা অবস্থায় ইলতুৎমিশ নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি যুদ্ধ বিদ্যায়ও পারদর্শী হন। এই মনিব পরিবার থেকে জামালউদ্দিন কারা নামে এক দাস ব্যবসায়ী ইলতুৎমিশকে দিল্লিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের নিকট বিক্রি করে দেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন ইলতুৎমিশের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পদের দায়িত্ব দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাদাউন-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

ক্ষমতারোহণ

১২১১ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিনের জামাতা ইলতুৎমিশ দিল্লির সুলতান মনোনীত হন। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু আমীর-ওমরাহগণ তাঁর আধিপত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এ পরিস্থিতিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের ক্রীতদাস ও জামাতা বাদাউন-এর শাসনকর্তা ইলতুৎমিশকে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। অভিজাতদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের অধিকর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

ক্ষমতারোহণের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ

সুলতান ইলতুৎমিশ সিংহাসনে আরোহণ করার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রথমত, তিনি বৈধতার প্রশ্নের সম্মুখীন হন। মুহাম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি হিসেবে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ, কুতুবউদ্দিন আইবক ও নাসিরউদ্দিন কুবাচা সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। কুতুবউদ্দিনের অবর্তমানে তাঁর জামাতা ও ক্রীতদাস ইলতুৎমিশের অবস্থান ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাজউদ্দিন ও নাসিরউদ্দিনের নিচে। এমতাবস্থায় তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ ইলতুৎমিশকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানান। এই দুর্বলতার সুযোগে নাসিরউদ্দিন কুবাচা, যিনি মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন এবং আগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আরাম শাহের পতনের পর লাহোর অধিকার করে সমগ্র সিন্ধু-পাঞ্জাব অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস পান। গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরীর সমগ্র সাম্রাজ্যের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব দাবি করেন। দ্বিতীয়ত, যদি ইলতুৎমিশ তাজউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করতেন তবে দিল্লির স্বাধীন সালতানাতের বিলুপ্তি ঘটতো এবং তা চলে যেতো

গজনীর অধীনে। তৃতীয়ত, ইলতুৎমিশের সঙ্গে দিল্লির তুর্কি আমীর ও মালিকদের সাংবিধানিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা মালিক ও আমীরগণ নিজেদেরকে সুলতানের সমকক্ষ বলতে ভাবতে থাকেন। চতুর্থত, কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে বাংলায় আলী মর্দান খলজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পঞ্চমত, রাজপুত রাজারাও একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ও স্থান পুনর্দখল করতে থাকেন– যেমন, রণথম্ভোর, কালিঞ্জর প্রভৃতি। তাছাড়া ইলতুৎমিশের রাজত্বকালেই দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ তাঁর বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবে ঢুকে পড়েন এবং ইলতুৎমিশের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেন। এ ধরনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করে ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাত রক্ষার প্রয়াস নিতে হয়।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

নানাবিধ সমস্যার কারণে ইলতুৎমিশকে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এমনকি তিনি নিজে সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ না করে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের নিকট হতে রাজকীয় তমগা গ্রহণ করা অধিকতর সমীচীন বলে মনে করতেন। এক সময় দিল্লির তুর্কি সৈন্যরাও বিদ্রোহ করে এবং এতে করে ইলতুৎমিশের অবস্থা সত্যিই বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। অনেক রক্তপাতের পর এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয় এবং দিল্লির চতুর্দিকে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা এগিয়ে যায়। অবশ্য একাজে ইলতুৎমিশের যথেষ্ট সময় লাগে। তিনি অচিরেই অনুভব করেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতানদের পরাস্ত করতে না পারলে সিংহাসনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে না। এদিকে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে লাহোর হতে বিতাড়িত করে পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকা জয় করলে ইলতুৎমিশের সামনে এক বিশেষ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়।তাজউদ্দিন সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন এবং ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লির এবং তাজউদ্দিন গজনীর সিংহাসন দখল করেন। কুতুবউদ্দিন অল্প সময়ের জন্য গজনী দখল করলেও সেখানকার আমীর– ওমরাহ্গণ তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে তাজউদ্দিনকেই সিংহাসনে পুনরায় বসান। দিল্লির দিকে তাজউদ্দিনের দৃষ্টি ছিল সব সময়ই। সেই তাজউদ্দিন লাহোর অধিকার করলে ইলতুৎমিশ নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেননি। সমূহ বিপদ এড়াতে তাজউদ্দিনের বিপরীতে অস্ত্র ধারণ করা ইলতুৎমিশের জন্য বলতে গেলে অনিবার্য ছিল।এ পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইলতুৎমিশ এতে জয়লাভ করেন। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ বন্দি হন এবং পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। এ সাফল্যে ইলতুৎমিশ আত্মবিশ্বাস ফিরে পান এবং আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি নাসিরউদ্দিন কুবাচাকেও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন বলে জানা যায়। কুবাচা সিন্ধু প্রদেশে পালিয়ে যান। পাঞ্জাব কুবাচার অধিকারমুক্ত হয়।

মোঙ্গলদের আক্রমণ

১২২১ খ্রিস্টাব্দের দিকে পাঞ্জাবে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সমগ্র দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় চেঙ্গিস খাঁ'র নেতৃত্বে মোঙ্গলরা দেশের পর দেশ আক্রমণ করে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করছিল। মোঙ্গলদের দ্বারা পশ্চিম এশিয়া, বলখ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি দেশ ও নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ১২২১ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ খাওয়ারিজম আক্রমণ করলে খাওয়ারিজম শাহ কাস্পিয়ান সাগরের দিকে পলায়ন করেন এবং শাহাজাদা জালালউদ্দিন ভারতের দিকে আসেন। শাহ পাঞ্জাবে পৌঁছে সিন্ধুনদের তীরে শিবির স্থাপন করেন। তিনি দিল্লিতে আশ্রয় পাবার জন্য সুলতান ইলতুৎমিশের নিকট আবেদনও করেন। কিন্তু এই ঘটনা ভারতে মোঙ্গল আক্রমণকে ডেকে আনতে পারে আশঙ্কা করে ইলতুৎমিশ চতুরতার আশ্রয় নেন। তিনি শাহকে বিনীতভাবে জানান যে, দিল্লির আবহাওয়া তাঁর জন্য কষ্টকর হতে পারে। একই সঙ্গে তিনি জালালউদ্দিন ও খাওয়ারিজম শাহ পূর্বাভিমুখী সম্প্রসারণ ঘটাতে চাইলে সমুচিত জবাব দেবার সামরিক প্রস্তুতিও নিতে থাকেন। অবশ্য এক্ষেত্রে যুদ্ধের কোনো দরকার হয়নি। এরপর জালালউদ্দিন ও খাওয়ারিজম শাহ পৃথক পৃথকভাবে ভারতের বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মোঙ্গলরাও ভারত আক্রমণের চেষ্টা থেকে বিরত হয়। প্রসঙ্গক্রমে একথাটি বলা দরকার যে, মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণের চেষ্টায় ভাটা পড়ার পিছনে অত্র অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়াও অনেকটা দায়ী ছিল।

পশ্চিম সীমান্তে কর্তৃত্ব সুরক্ষা

চেঙ্গিস খাঁ'র অভিযান অপসারিত হলে ইলতুৎমিশ বিদ্রোহ দমন ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করার কাজে হাত দেন। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তিনি এ লক্ষে কাজ করে যান। খাওয়ারিজম শাহ'র আক্রমণে সিন্ধুতে নাসিরউদ্দিন কুবাচার শক্তিক্ষয় হয়। সে সুযোগে ইলতুৎমিশ কুবচাকে আক্রমণ করেন। লাহোর, মুলতান অধিকার করার পর সুলতান কুবাচার রাজধানী উচ্ অবরোধ করেন। কুবাচা পালিয়ে বাক্কার দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু ইলতুৎমিশ বাক্কার দুর্গও অবরোধ করলে অসহায় কুবাচা সন্ধির প্রস্তাব দেন। সুলতান কুবাচাকে আত্মসমর্পনের আহ্বান জানালে কুবাচা আবারও পলায়ন করেন এবং সিন্ধু নদে নৌকা ডুবিতে তাঁর সলিল সমাধি হয় বলে জানা যায়। এভাবে মুহাম্মদ ঘোরীর দুজন সেনাপতি তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ এবং নাসিরউদ্দিন কুবাচা অপসারিত হন। ইলতুৎমিশ তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপনে সফল হন।

বাংলায় বিদ্রোহ দমন

কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকর্তা আলী মর্দান খলজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২১১ খ্রিস্টাব্দে আলী মর্দান খলজীকে হত্যা করে হুসামউদ্দিন ইওয়াজ সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী উপাধি ধারণ করে লখনৌতির সিংহাসনে বসেন।১২২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশ লখনৌতি আক্রমণ করে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ইওয়াজ সুলতানকে বিপুল ধনরত্ন উপহার দেন এবং সুলতানের নামে খোৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সুলতান দিল্লি ফিরে যেতে না যেতেই ইওয়াজ এ প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করেন। এমনকি ইওয়াজ ইলতুৎমিশ কর্তৃক নিযুক্ত বিহারের শাসনকর্তা মালিক আলাউদ্দিন জানীকে বিহার হতে বিতাড়িত করেন এবং পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। সুলতান ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠপুত্র অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ইওয়াজ খলজীর বিরুদ্ধে এ পর্যায়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে ইওয়াজ পরাজিত ও নিহত হন। লখনৌতি তথা বাংলা পুনরায় দিল্লির প্রদেশে পরিণত হয়। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু হলে বাংলার খলজী মালিকগণ পুনরায় ইলতুৎমিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অভিযান

১২২৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ রণথম্ভোর এবং পরের বছর মান্দোল ও সিওরালিক জয় করেন। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়র অধিকৃত হয়– রাজা মঙ্গলদেব বীরবিক্রম শত্রুদের বাধা দিয়ে বিশেষ কোনো সাফল্য না পেয়ে অবশেষে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এভাবে উত্তর ভারতে ইলতুৎমিশের শাসন ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মালব আক্রমণ করে ভিলসা দুর্গ অধিকার করেন। সেখান থেকে উজ্জয়িনী আক্রমণ করে অতি সহজে উজ্জয়িনী দুর্গও অধিকার করে নেন। সুলতান সেখানকার বিখ্যাত মহাকালী মন্দির ধ্বংস করে সেখান থেকে মূর্তি নিয়ে আসেন দিল্লিতে। দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পর ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশের মৃত্যু হয়।

খলিফার সনদ লাভ

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ লক্ষ করেন যে, তুর্কি মালিক ও আমীরগণ তাঁর সমান মর্যাদা দাবি করছেন। তাই তিনি তাঁর বৈধতা ও রাজকীয় মর্যাদা স্থাপনে সচেষ্ট হন। এ লক্ষ্যে ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদের খলিফার রাজকীয় সনদ (investiture) এবং সম্মানিত পোষাক (robes of honour) পাবার জন্য প্রয়াসী হন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাগণ ছিলেন সারা মুসলিম জাহানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সার্বভৌম

কর্তৃত্বের অধিকারী। মুসলমান শাসন দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হলে প্রত্যন্ত এলাকার শাসকগণ খলিফার 'সনদ' লাভের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতাকে বৈধ করতেন। সেকালে প্রচলিত ধারণা মতে, খলিফার অনুমতিসূচক সনদ ব্যতিত কেউই আইনসম্মত শাসক নন। তাই ইলতুৎমিশও সনদ ও পোষাক প্রাপ্তির মাধ্যমে সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেন। তিনি 'সুলতান-ই-আজম' উপাধিতে ভূষিত হন। এভাবে তিনি হন দিল্লির বৈধ শাসক ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় উচ্চস্থানের অধিকারী। সুলতান ইলতুৎমিশ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম ভারতে খাঁটি আরবি মুদ্রা অর্থাৎ আরবি ভাষা খোদিত মুদ্রার প্রচলন ঘটান। মুদ্রায় তিনি বাগদাদের খলিফার নাম অঙ্কন করেন এবং নিজেকে 'বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী' হিসেবে দাবি করেন।

ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব: চারিত্রিক দৃঢ়তা

তুর্কি ভাষায় 'ইলতুৎমিশ' শব্দটির অর্থ হলো 'সাম্রাজ্যের পালনকর্তা'। নামের অর্থের বিচারে ইলতুৎমিশ সার্থক ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে তাঁর আমল থেকেই আরম্ভ হয়। যদিও সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী উত্তর ভারত জয় করেন এবং মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন; কুতুবউদ্দিন আইবক তাঁর স্থায়িত্ব বিধান করেন– তথাপি সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস, বীরত্ব এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যতিত তা ফলপ্রসূ হতো কিনা সন্দেহ। ঘোরী এবং কুতুবউদ্দিনের পর দেশে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে ইলতুৎমিশ তাঁর দৃঢ়তা দিয়ে তা প্রতিহত করেন। দিল্লি সালতানাতের শত্রুদেরকে তিনি যথার্থভাবে মোকাবেলা করেন। মোঙ্গল আক্রমণের ফলে যে বিপদ ঘনীভূত হয়, তাও তিনি কাটিয়ে ওঠেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শাসন সংগঠন

স্বাধীন দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠায় ইলতুৎমিশের অবদানকে স্বীকার করতেই হবে। তাঁর শাসন সংগঠনের কারণে বহির্ভারতীয় শক্তির পক্ষে দিল্লির ওপর আধিপত্য দাবি করা সম্ভব হয়নি। সিংহাসনে উপবেশনকালে ইলতুৎমিশ কোনো শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য বা শাসনতান্ত্রিক উত্তরাধিকার পাননি। কুতুবউদ্দিন আইবক প্রকৃত শাসনতন্ত্র নয় বরং যে সামরিক রাজতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন তার ওপরই ইলতুৎমিশকে আপন যোগ্যতায় উপযুক্ত শাসন সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। তিনি তুর্কি ও অ-তুর্কিদের সাহায্য নিয়ে সুলতানি শাসনযন্ত্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। হিন্দু সামন্তরাজাদের শাসিত রাজ্যে তিনি স্বায়ত্বশাসন দান করেন। ইক্তা প্রথা দ্বারা তিনি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন জেলায়ও ভাগ করেন।

দিল্লির মর্যাদা বৃদ্ধি

ইলতুৎমিশ উপলব্ধি করেন যে, স্বাধীন সালতানাতের রাজধানী হিসেবে দিল্লির কোনো মর্যাদা ইসলামি বিশ্বে নেই। দিল্লির তুলনায় লাহোরের নাম তখন বেশি পরিচিত ছিল। ইলতুৎমিশ দিল্লিতে প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার, খানকাহ্ নির্মাণ করেন। এভাবে সুসজ্জিত দিল্লির খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। তিনি কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। ইসলামি বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদেরকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের কল্যাণেও দিল্লির নাম বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এরপর থেকে দিল্লির মর্যাদা কালে কালে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সামগ্রিক মূল্যায়ন

সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলেও তাঁর কাজের কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমত, ইলতুৎমিশের রাজস্ব নীতি ছিল বেশ দুর্বল। দ্বিতীয়ত, দিল্লি সালতানাতের সঙ্গে তুর্কি অভিজাতদের সাংবিধানিক সম্পর্ক তিনি সঠিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে পারেননি।যেহেতু তিনি তুর্কি অভিজাতদের মধ্য থেকে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত, সেহেতু অভিজাতরাও নিজেদেরকে সুলতানের সমকক্ষ ভাবতেন। অবশ্য ইলতুৎমিশ তাঁর কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত

করে সিংহাসনের অধিকারকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও তা সেই অর্থে সফল হয়নি। তৃতীয়ত, ইলতুৎমিশ প্রশাসনে ভারতীয়করণের দিকে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হন। তাঁর হাতে প্রশাসনযন্ত্রের তুর্কিকরণ ঘটে। তদুপরিও ইলতুৎমিশকে দিল্লির 'দাস' বংশীয় সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। একজন ঐতিহাসিকের মতে, "ইলতুৎমিশ এই দেশকে দিয়েছিলেন একটি রাজধানী (দিল্লি), একটি স্বাধীন রাজ্য (গজনী ও ঘোরের অধীনতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও খলিফা কর্তৃক স্বীকৃত), একটি রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং (তুর্কি আমীরদের দ্বারা গঠিত)–একটি শাসক শ্রেণী।" একজন দক্ষ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি স্থান লাভ করেছেন। তাঁর বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ। তিনি বলেন, "ধর্মে অগাধ আস্থাবান, ফকির, ভক্ত, সাধুসজ্জন এবং ধর্ম ও অনুশাসন প্রণেতাদের প্রতি এরূপ ভক্তিশীল ও দয়ালু কোনো নরপতি ইতোপূর্বে কখনো বিশ্বজননীর ক্রোড় হতে বিশাল রাজ্য হস্তগত করতে পারেননি।"

সারসংক্ষেপ

কুতুবউদ্দিন আইবকের ক্রীতদাস ও জামাতা ইলতুৎমিশ ১২১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান হিসেবে সিংহাসনারোহণ করেন। কাজটি অবশ্য নিষ্কণ্টক ছিল না। মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ, পশ্চিম সীমান্তে কর্তৃত্ব সুরক্ষা, বাংলায় বিদ্রোহ দমন, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অভিযান, খলিফার সনদ লাভ, শাসন সংগঠন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ইলতুৎমিশের কিছু না কিছু সাফল্য ও কৃতিত্ব রয়েছে। তাই সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এ বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক বিদ্যমান থাকলেও ইলতুৎমিশকে 'দাস বংশীয়' সুলতানদের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ' বলা যেতে পারে। একজন দক্ষ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে তিনি স্থান লাভ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইলতুৎমিশকে সর্বপ্রথম বিক্রি করা হয় কার কাছে?
(ক) জামালউদ্দিন কারা (খ) কুতুবউদ্দিন আইবক
(গ) সদর-ই-জাহান (ঘ) তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ।

২। মোঙ্গলদের হাতে কোন অঞ্চলটি ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়?
(ক) সমরখন্দ (খ) বাদাউন
(গ) রণথম্ভোর (ঘ) দিল্লি

৩। ইলতুৎমিশ বাংলায় কার বিদ্রোহ দমন করেন?
(ক) আলী মর্দান খলজী (খ) শিরান খলজী
(গ) আলাউদ্দিন জানী (ঘ) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী।

৪। ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ কোন দুর্গ দখল করেন?
(ক) ভিলসা দুর্গ (খ) চুনার দুর্গ
(গ) একডালা দুর্গ (ঘ) সিকড়িগড় দুর্গ।

৫। ইলতুৎমিশ খলিফার সনদ লাভ করেন কত সালে?
(ক) ১২১৫ খ্রিঃ (খ) ১২২১ খ্রিঃ
(গ) ১২২৫ খ্রিঃ (ঘ) ১২২৯ খ্রিঃ।

৬। ইলতুৎমিশের রাজধানী কোনটি?
(ক) লাহোর (খ) দিল্লি
(গ) পাঞ্জাব (ঘ) কালিঞ্জর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা প্রতিহতকরণ ও বাংলায় বিদ্রোহ দমনে সুলতান ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

২। সুলতান ইলতুৎমিশ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সিংহাসনে আরোহণের সময়ে ইলতুৎমিশ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? তিনি কিভাবে এগুলোর সমাধান করেন?

২। দিল্লির সুলতানি শাসন সুদৃঢ়করণে ইলতুৎমিশের অবদান কি ছিল?

৩। ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব আলোচনা করুন। তাঁকে দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় কি?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India.*

২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

৩। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*

৪। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারতের ইতিহাস*, ২য় খন্ড।

পাঠ - ৩

সুলতান রাজিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- রাজিয়ার ক্ষমতারোহণের প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন ;
- রাজিয়ার বিরোধী পক্ষ এবং তাঁর পতন সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- রাজিয়ার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ক্ষমতারোহণের প্রেক্ষাপট

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসন নিয়ে সংকটের সৃষ্টি হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদের অকাল মৃত্যু এবং অকর্মণ্য অন্য পুত্রদের নিয়ে ইলতুৎমিশ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে ইলতুৎমিশ তাই পুত্রদের দাবি উপেক্ষা করে কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু রাজ্যের আমীর-ওমরাহ্গণ নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হয়ে ইলতুৎমিশের জীবিত পুত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সুলতান মনোনীত করেন। তুর্কি আমীরগণ বংশানুক্রমিক অধিকার অপেক্ষা তাদের মনোনীত প্রার্থীকেই সিংহাসনে স্থাপন করা তুর্কি প্রথা ও সংবিধানসম্মত বলে মনে করতেন। এভাবে রাজিয়ার দাবি নস্যাৎ হয় এবং রুকনউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। রুকনউদ্দিন উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্বলতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। অকর্মণ্য এই সুলতান ব্যাভিচারে ও হীনকার্যে মত্ত থাকতেন এবং রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছভাবে খরচ করতেন। মাতা শাহ তুর্কান ছিলেন সুলতানের প্রধান মন্ত্রণাদাত্রী। এমনকি শাসনকার্য পরিচালনার সকল ক্ষমতা ধীরে ধীরে সুলতানের ন্যায়ান্যায়বোধহীন মাতার হস্তগত হয়। শাহ তুর্কান ছিলেন ক্ষমতালিপ্সু রমণী। প্রথমে তিনি অন্ত:পুরের দাসী ছিলেন। পরে তিনি রাজমাতা হন। একই সাথে এই রমণী ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর। যাহোক মাতা-পুত্র উভয়ের যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এ পরিস্থিতিতে বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।মাতা-পুত্র চক্রান্ত করে ইলতুৎমিশের অপর এক পুত্র কুতুবউদ্দিনকে হত্যা করেন, ফলে রাজধানীর অনেক আমীর-ওমরাহ্ সুলতানের প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন হন। অবশেষে মুলতান, লাহোর, হান্সি ও বাদাউনের বিদ্রোহী শাসনকর্তাগণ ও কিছু তুর্কি আমীর সুলতান রুকনউদ্দিন ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সুলতান সম্মিলিত বাহিনীকে বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এদিকে সুলতান রুকনউদ্দিন যখন বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন রাজিয়া সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টায় রত। রাজ্যের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দিল্লির নাগরিকদেরকে তিনি শাহ তুর্কানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। জানা যায়, দিল্লির জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায়রত মুসলমানদের নিকট হাজির হয়ে রাজিয়া রুকনউদ্দিন ফিরোজের আত্মঘাতী নীতির প্রতি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সুলতান হিসেবে তাঁকে মেনে নেয়ার জন্য সকলের প্রতি বিনীত আহ্বান জানান। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করবেন বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।প্রার্থনারত মুসলমানদের মধ্যে এই আবেদন ইতিবাচক সাড়া জাগায় এবং যারা এতোদিন নিরপেক্ষ ছিলেন তারা রাজিয়ার পক্ষাবলম্বন ও তাঁকে সিংহাসনে বসাতে মনস্থির করেন। রাজধানীর সামরিক কর্মকর্তারাও রাজিয়ার পক্ষ নিলে রুকনউদ্দিনের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে। অবশেষে দিল্লির আমীরগণ রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজিয়াকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজিয়াকে 'সুলতান' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। মাত্র সাত মাসের রাজত্ব শেষে রুকনউদ্দিন বন্দি ও নিহত হন (১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে)।

রাজিয়ার সিংহাসনারোহণের তাৎপর্য

সুলতান রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণের কিছু সাংবিধানিক তাৎপর্য ছিল। প্রথমত, এই প্রথম দিল্লির সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নাগরিকগণ স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকৃতই রাজিয়ার শক্তির প্রধান উৎস ছিল দিল্লির নাগরিকবৃন্দ। রাজধানীর নাগরিকদের সমর্থনে কোনো একজন নারীর পক্ষে সিংহাসনে উপবেশন করার এটাই হলো প্রথম দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের সমর্থনে সিংহাসন লাভের ফলে রাজিয়া একটি অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। জনগণকে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে,তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করবেন। তৃতীয়ত, সুলতান ইলতুৎমিশ যোগ্য ও উপযুক্ত হিসাবেই যে রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন তার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। একদিকে ইলতুৎমিশের ইচ্ছা সম্মানিত হয় এবং অন্যদিকে সিংহাসনের ওপর রাজিয়ার দাবিও বৈধ বা স্বীকৃত হয়। চতুর্থত, মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে রাজিয়াই হলেন সর্বপ্রথম নারী 'সুলতান'। রাজিয়ার সিংহাসনারোহণের পিছনে উলামাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দিল্লির সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে উলামাদের সমর্থন নিস্প্রয়োজন। পঞ্চমত, রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণের আরো তাৎপর্য এই ছিল যে, তিনি তুর্কি অভিজাতদের হাতে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা করেন। রাজিয়াই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা পরবর্তীতে গিয়াসউদ্দিন বলবন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন বলে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা।

সিংহাসনারোহণের বিরোধিতা

রাজিয়ার সিংহাসনারোহণ একেবারে নিষ্কন্টক ছিল না। সৈন্যবাহিনী, রাজকর্মচারী, দিল্লির জনগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একটি বড় অংশের সমর্থনে সিংহাসনে বসলেও অচিরে রাজিয়া এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষ করে যে সকল ইক্তাদার বা প্রাদেশিক আমীর, রুকনউদ্দিনের বিরুদ্ধে দিল্লি অভিযান করেন, তাঁরা দিল্লির জনসাধারণ ও দরবারের আমীরদের দ্বারা রাজিয়ার নির্বাচনকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। এই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 'উপেক্ষিত ও অপমানিত বোধ' করে জোরেশোরে রাজিয়ার বিরোধিতা করেন। বদাউন, মুলতান, হান্সি ও লাহোরের শাসনকর্তাগণ দিল্লিতে রাজিয়াকে অবরোধ করেন। এ সকল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি রাজিয়ার ছিল না, কিন্তু কূটনীতির মাধ্যমে তিনি বিরোধী জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টির প্রয়াস পান। বিদ্রোহীদের একতা বিনষ্ট হয় এবং কেউ কেউ পালিয়েও যান। অত:পর 'লখনৌতি হতে (সিন্ধুদেশের) দেবল পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের সমস্ত মালিক ও আমীরগণ বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করেন'। বিরোধী চক্রের নেতা নিজাম-উল-মুলক জুনাইদি নিহত হন। বাংলার শাসনকর্তা পুনরায় দিল্লির আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং উচে জনৈক বিশ্বস্ত শাসনকর্তাকে নিয়োগ করা হয়। এভাবে আপাতত রাজিয়া বিপদমুক্ত হন।

তুর্কি অভিজাতদের বিদ্রোহ

মহিলার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা মুসলিম জগতে অবিদিত বা অননুমোদিত না হলেও রাজিয়ার বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি ছিল। তিনি স্ত্রীলোকের বেশভূষা ত্যাগ করে এবং অন্ত:পুর ছেড়ে বাইরে আসায় অনেক গোঁড়া মুসলমান তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। রাজিয়া পুরুষের বেশে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তাছাড়া রাজিয়ার শাসন সংগঠন নীতিও তুর্কি আমীরগণ ঠিকমতো মেনে নিতে পারেননি; বিশেষ করে একজন হাবসী ক্রীতদাসকে উচু পদ প্রদান। জামালউদ্দিন ইয়াকুত নামে আবিসিনিয়া হতে আগত এই কর্মচারীর প্রতি রাজিয়া মাত্রাতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখাতেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তখনকার দিনে তুর্কি আমীর-ওমরাহ্গণ এক সংকীর্ণ সামন্ততন্ত্র গঠন করেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার একাধিপত্য দাবি করতেন। তাঁরা তাঁদের জাতিগত অধিকার ত্যাগ করতে বা রাজকীয় কর্তৃত্বের নিকট নতি স্বীকার করতে

একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। এমতাবস্থায় সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। রাজিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী যে আমীর প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কবীর খাঁ আয়াজ। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে এ বিদ্রোহ দমন করেন। কবীর খাঁ বিনাযুদ্ধে রাজিয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নেন। কিন্তু অচিরেই তিনি আরও তীব্রতর বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তুর্কি ওমরাহদের প্ররোচনায় ভাতিন্দার শাসনকর্তা ইখতিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'আমীর-ই-হাজিব' পদাধিকার ইখতিয়ারউদ্দিন আইতিগীন ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা। বিদ্রোহ দমন করতে রাজিয়া বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ভাতিন্দায় পৌঁছুবার পর রাজিয়ার প্রিয়পাত্র জামালউদ্দিন ইয়াকুতকে হত্যা করা হয় এবং রাজিয়া বন্দি হন। রাজিয়া স্বীয় কুটবুদ্ধির দ্বারা এই বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে বন্দি রাজিয়ার সাথে আলতুনিয়ার বিয়ে হয়। অত:পর উভয়ে এক সাথে দিল্লির দিকে রওনা হন। কিন্তু ইতোমধ্যে ইলতুৎমিশের অপর এক পুত্র মুইজউদ্দিন বাহরামকে আমীর-ওমরাহ্গণ দিল্লির সিংহাসনে বসাবার ব্যবস্থা করেন। সিংহাসন পুনরুদ্ধারে রাজিয়া ও আলতুনিয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁরা উভয়েই মুইজউদ্দিন বাহরামের কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

রাজিয়ার পতনের কারণ

সুলতান রাজিয়া প্রায় সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পতনের মূল কারণ হিসেবে সুলতান ও আমীরদের মধ্যে বিরোধের কথা বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠার সময় হতে আমীর-ওমরাহ্গণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। আরাম শাহের বিরুদ্ধে ইলতুৎমিশের সিংহাসনারোহণের মূলেও ছিল আমীরদের কারসাজি। মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রায়শই তরবারির ব্যবহার হতো। ইলতুৎমিশের কোনো সুযোগ্য পুত্র সন্তান না থাকায় এ সময়ে আমীরগণ আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর থেকে বলবনের ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত সময়ে আমীর-ওমরাহ্গণই রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন– এ মন্তব্যে কোনো অত্যুক্তি নেই। আমীরগণ 'চল্লিশ জন'-এর জোট গঠন করে নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যের বড় বড় জায়গীর এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান পদ ভাগ করে নিতেন। এই চল্লিশ জনের (বন্দেগান-ই-চেহেলগান) ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। সুলতান অনেক ক্ষেত্রে এদের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। যাহোক রাজকার্য সম্পাদনকালে প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা এবং তুর্কি আমীরদের একাধিপত্যে হস্তক্ষেপ– প্রধানত এ দুটি কারণেই রাজিয়ার পতন ত্বরান্বিত হয়।

কৃতিত্ব

রাজিয়া একজন গুণধর রমণী ছিলেন। তিনি সহসী, সফল রাজনীতিবিদ, ন্যায়পরায়ণ ও জনহিতকামী ছিলেন। তিনি বিদ্যা ও গুণের কদর জানতেন। প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ দমন শেষে তিনি শাসন সংগঠনের কাজে হাত দেন। তাঁর অনুগতরা বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। রাজিয়ার শাসন সংগঠনের ফলে পূর্বে বাংলা হতে পশ্চিমে সিন্ধু অঞ্চলে তাঁর 'কর্তৃত্ব বলয়' সম্প্রসারিত হয়। তিনি একজন পুরুষ সুলতানের মতোই রাজকার্য পরিচালনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পর্দার ব্যবহার তিনি ত্যাগ করেন। এমনকি হাতির পিঠে চড়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। সরকারি পদে অ-তুর্কিদের নিয়োগ দান তাঁর আমলে পরিলক্ষিত হয়। 'আমীর-ই-আখুর' (রাজকীয় অশ্বশালার অধিপতি) পদে তিনি আবিসিনিয়ার জামালউদ্দিন ইয়াকুতকে নিয়োগ দান করেন। সুলতান রাজিয়াকে অনায়াসে একজন যোগ্য শাসক বলা যেতে পারে। কোন কোন লেখক তাঁকে 'সুলতানা' বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তুর্কি ভাষায় 'সুলতানা' শব্দের অর্থ 'সুলতানের পত্নী'– 'রাজ্যের শাসনকর্তৃ' নয়। তাছাড়া রাজিয়াও নিজের মুদ্রায় 'সুলতান' খেতাব ব্যবহার করেছেন। সুলতানি যুগের ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ তাঁকে "শ্রেষ্ঠ শাসক, বুদ্ধিমতি, ন্যায়পরায়ণা, দয়াশীলা, বিদ্যোৎসাহিনী, সুবিচারক, প্রজাবৎসলা, সমরকুশলা এবং অন্যান্য সকল প্রশংসনীয় রাজোচিত গুণের অধিকারিণী" বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মিনহাজ একই সাথে দুঃখভরে প্রশ্ন করেন, 'এসকল অসামান্য গুণ রাজিয়ার কোন্ উপকারে এলো?'

সারসংক্ষেপ

সুলতান ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাজিয়াই প্রথম সুলতান যিনি নাগরিকগণের স্বত:প্রবৃত্ত সিদ্ধান্তে ক্ষমতায় বসেন। এছাড়া তিনিই হলেন সর্বপ্রথম মহিলা সুলতান এবং তিনিই প্রথম কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কয়েকজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাজিয়ার বিরোধিতা করেন। রাজিয়া তুর্কি অভিজাতদের বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন। যাহোক, সাড়ে তিন বছরের রাজত্ব শেষে রাজিয়ার পতন হয়। রাজকার্য সম্পাদনকালে প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা এবং তুর্কি আমীরদের একাধিপত্যেহস্তক্ষেপ– প্রধানত এ দুটি কারণেই রাজিয়ার পতন ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া রাজিয়ার রাজত্বকালেই 'চল্লিশের দল' বেশশক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুলতান রাজিয়াকে অনায়াসে একজন যোগ্য শাসক বলা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। ইলতুৎমিশ কাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন?
   (ক) রাজিয়াকে (খ) নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে
   (গ) রুকনউদ্দিন ফিরোজকে (ঘ) কাউকেই নয়।

২। রাজিয়াকে 'সুলতান' ঘোষণা করা হয়কত সালে?
   (ক) ১২৩৪ সালে (খ) ১২৩৫ সালে
   (গ) ১২৩৬ সালে (ঘ) ১২৩৭ সালে।

৩। দিল্লির সুলতানগণ কাদের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছিল?
   (ক) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের (খ) বন্দেগান-ই-চেহেলগানদের
   (গ) মুলতান, লাহোর, বদাউন, হান্সির সম্মিলিত জোটের
   (ঘ) বহির্দেশীয় শক্তির।

৪। রাজিয়ার 'কর্তৃত্ব বলয়' ছিল–
   (ক) পূর্বে কামরূপ থেকে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত
   (খ) উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত
   (গ) পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত
   (ঘ) উত্তরে দিল্লি থেকে দক্ষিণে হায়দরাবাদ পর্যন্ত

৫। 'আমীর-ই-আখুর' অর্থ কি?
   (ক) অশ্বশালার অধিপতি (খ) সৈন্যবাহিনীর অধিপতি
   (গ) গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান (ঘ) ধর্মীয় আমীর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। রুকনউদ্দিন ফিরোজ শাহ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। সুলতান রাজিয়ার পতনে তুর্কি অভিজাতদের কি ভূমিকা ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সুলতান রাজিয়া ক্ষমতারোহণের প্রেক্ষাপট এবং সিংহাসনারোহণের তাৎপর্য আলোচনা করুন।

২। সুলতান রাজিয়ার উত্থান ও পতনের সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনাপূর্বক তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

২। A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India.*
৩। R.C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People,* Vol. VI *Delhi Sultanate*.
৪। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*
৫। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস।*
৬। আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*

পাঠ - ৪

গিয়াসউদ্দিন বলবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- বলবনের প্রাথমিক জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন ;
- সুলতান হিসাবে তাঁর সমস্যাবলী ও কার্যকলাপের বিবরণ দিতে পারবেন ;
- রাজতন্ত্র সম্পর্কে বলবনের মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলী আলোচনা করতে পারবেন ;
- সুলতান হিসাবে বলবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু হলে উলুঘ খান বলবন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর জন্য কেউ কেউ বলবনকে দায়ী করেছেন। বারাণী এ সম্পর্কে নীরব থাকলেও ইবনে বতুতা ও ইসামী বলেছেন যে, বলবন সুলতানকে হত্যা করেছিলেন।

বলবন ছিলেন তুর্কিদের ইলবারি উপজাতির লোক। তাঁর পিতা ছিলেন দশ হাজার তুর্কি পরিবারের খান বা নেতা। যৌবনে মোঙ্গলদের হাতে বন্দি হয়ে তাঁকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। খাজা জামালউদ্দিন বসরী তাঁকে ক্রয় করে দিল্লিতে এনে ইলতুৎমিশের কাছে বিক্রি করেন। নিজের দক্ষতা ও গুণের বলে বলবন ক্রমে উন্নতি লাভ করেন এবং 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা চল্লিশ জন আমীরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন। ইলতুৎমিশের আমলে বলবন প্রথমে খাসবরদার বা সুলতানের 'খাসনফর' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুলতান রাজিয়ার উচ্ছেদে বলবন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সুলতান মুইজউদ্দিন বাহরামের রাজত্বকালে তিনি 'আমীর-ই-আখুর' বা রাজকীয় অশ্বশালার অধিপতি নিযুক্ত হন। নাসিরউদ্দিন মাহমুদের সিংহাসনারোহণের পর উলুখ খান বলবন 'ভকিল-ই-দার' বা রাজ্যের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হন। নাসিরউদ্দিন মাহমুদ সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বলবনই প্রকৃতপক্ষে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ্ বলেছেন যে, নাসিরউদ্দিন প্রায় বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু শাসন করেননি। ইসামী বলেছেন যে, সুলতান রাজপ্রাসাদে থাকতেন এবং উলুঘ খানই সাম্রাজ্যের শাসন কাজ পরিচালনা করতেন।

১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসিরউদ্দিন বলবনের কন্যাকে বিয়ে করেন, ফলে বলবনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। বলবন রাজ প্রতিনিধি বা 'নায়েব-ই-মামলুকাৎ' নিযুক্ত হন। প্রশাসন ও সেনাবাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়েছিল। ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে পদচ্যুত হলেও এক বছর পরই বলবন আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। বস্তুত, নাসিরউদ্দিনের রাজত্বকালে বলবনই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও বলবন সাম্রাজ্যের স্বার্থেই তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। প্রশাসনকে গতিশীল করে তিনি দিল্লি সালতানাতের অবনতি রোধ করেন। তিনি হিন্দুদের আগ্রাসনের মোকাবেলা করেছিলেন এবং কূটনীতি ও সামরিক কর্মোদ্যোগের বিচক্ষণ সমন্বয় ঘটিয়ে মোঙ্গলদের আক্রমণের হাত থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন।

বলবনের সমস্যাবলী

সিংহাসনে আরোহণের পর বলবন বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল।এ সুযোগে তুর্কি আমীররা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তুর্কি আমীরদের দুটি উদ্দেশ্য ছিল– প্রথমত, সুলতানকে শক্তিশালী হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করা। সে সময় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং দিল্লি সাম্রাজ্যে সব সময়ই মোঙ্গলদের আক্রমণের ভয় ছিল। তাছাড়া স্থানীয় হিন্দুদের বিদ্রোহ ও দস্যুদের উপদ্রব তাঁকে ব্যস্ত করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে বারাণী বলেছেন, "শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ভীতি যা সকল সুষ্ঠু প্রশাসনের ভিত্তি এবং রাষ্ট্রের মহিমা ও গৌরবের উৎস, তা জনগণের মন থেকে মুছে গিয়েছিল এবং দেশ এক শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছিল।" এ পরিস্থিতিতে একজন শক্তিশালী একনায়কের প্রয়োজন ছিল।

বলবন তাঁর সমস্যাগুলো সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সুলতানের মর্যাদা পুনরুদ্ধার, রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী এবং পূর্বসুরীদের বিজয়কে সংহত করার লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এসব সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র এবং প্রশ্নাতীত রাজতন্ত্র একান্ত আবশ্যকীয়। কাজেই তিনি প্রথমে বিভিন্নভাবে সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

রাজতন্ত্র সম্পর্কে বলবনের মতবাদ

সম্ভবত বলবনই দিল্লির একমাত্র সুলতান যিনি রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মতবাদ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সুলতানের উঁচু মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলার কোনো সুযোগ তিনি হারাতেন না। রাজতন্ত্রকে উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আমীরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে এটা যে অত্যাবশ্যকীয় ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সিংহাসনে তাঁর বংশগত কোনো দাবি না থাকায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজেকে ফেরদৌসীর শাহানামার বিখ্যাত তুর্কি বীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে প্রচার করেন। বংশ মর্যাদার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নিচু বংশের কোনো লোককেই তিনি রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতেন না। নিচু বংশজাত ব্যক্তিদের তিনি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থেকে অপসারণ করেন।

বলবন তাঁর কাজ ও কথার দ্বারা সবসময়ই সুলতানের দেহের পবিত্রতার গুরুত্ব প্রকাশ করতেন। পুত্র বুঘরা খানকে তিনি একবার বলেছিলেন যে, "রাজতন্ত্র হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের মূর্ত প্রকাশ। সুলতানের হৃদয় হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের বিশেষ আধার এবং এ বিষয়ে মানবজগতে তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" তাঁর মতে সুলতান হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি (নিয়াবত-ই-খোদায়ী) এবং মর্যাদায় রসুলের পরেই তাঁর স্থান। রাজকীয় দায়িত্ব পালনে সুলতান সবসময়ই খোদা কর্তৃক পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হন। বস্তুত এসব প্রচার করে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সুলতানের ক্ষমতার উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্, আমীর বা জনগণ নয়। ফলে তাঁর কার্যাবলীর সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই।

বাহ্যিক মর্যাদা ও সাফল্য ছিল সুলতানের জন্য অপরিহার্য। এই কারণে বলবন সারা জীবনই জনগণের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন– এমনকি তিনি সাধারণ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথাও বলতেন না। দিল্লির এক ধনী ব্যবসায়ী তার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে বলবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন– বলাই বাহুল্য তার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। পূর্ণ রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত না হয়ে বলবন কখনো দরবারে উপস্থিত হতেন না। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারকরাও কখনো তাঁকে রাজকীয় পোশাক ছাড়া দেখেনি।

বলবন মনে করতেন যে, ইরানি রীতিনীতি ও জীবন ধারা অনুসরণ করা ছাড়া রাজত্ব করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রতিটি বিষয়েই তিনি সতর্কতার সঙ্গে ইরানি রীতিনীতি অনুসরণ করেছিলেন। সিংহাসনে বসার আগে জন্ম নেওয়া তাঁর পুত্রদের নাম তিনি রেখেছিলেন মাহমুদ, মুহাম্মদ ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর সিংহাসনারোহণের পর জন্ম নেওয়া তাঁর পৌত্রদের নাম তিনি ইরানি রাজাদের নামের অনুকরণে রেখেছিলেন কায়কোবাদ, কায়খসরু, কায়মুর্‌স ইত্যাদি।

ন্যায় বিচারকে বলবন সুলতানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য রূপে বিবেচনা করেন। কিছু কিছু দোষ সত্ত্বেও তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের এ ছিল এক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যা জনসাধারণের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার কোনো ঘটনা জানলে তিনি তাঁর কর্মচারী বা নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ তাঁর গুপ্তচররা (বারিদ) তাঁকে জানাতো এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংবাদ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বারিদরাও কঠিন শাস্তি ভোগ করতো।বারাণী উল্লেখ করেছেন যে গৃহভৃত্যদের প্রতি নির্দয় আচরণের অপরাধে বাদাউনের ইকতাদার মালিক বকবক এবং অযোধ্যার ইকতাদার হায়বত খান যথাক্রমে মৃত্যুদন্ড ও আর্থিক জরিমানায় দন্ডিত হয়েছিলেন।

সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি

সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বলবন ইরানি কায়দায় তাঁর দরবার সাজিয়েছিলেন। হাজির, সালাহদার, জানদার, নকীব প্রমুখেরা নীরবে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকত। দরবারে প্রবেশাধিকার লাভকারীদের জন্য তিনি 'সিজদা' ও 'পায়বস' (পদ-চুম্বন) বাধ্যতামূলক করেছিলেন। দরবারে হাসি-ঠাট্টা ও লঘু আলাপ তিনি বন্ধ করে দেন। অল্প কয়েকজন বিশ্বস্ত মালিক ও তাঁর বন্ধু সুলতানের সিংহাসনের পিছন দিকে বসতেন– বাকী সকলকেই পদমর্যাদা অনুসারে তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। দরবারে বলবনকে কখনো কেউ হাসতে বা লঘু আলাপ করতে দেখেনি, বহু গুরুতর ব্যক্তিগত শোকাবহ ঘটনাতেও তিনি কখনো দরবারে নিজের আবেগ প্রকাশ করেননি। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রিয় পুত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুহাম্মদ মোঙ্গলদের হাতে নিহত হলে তিনি প্রচন্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন– এর কিছুদিন পরই সুলতান মারা যান। কিন্তু এ প্রচন্ড শোক বুকে চেপে তিনি দরবারে তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলেন। গভীর রাতে নিজ শয়নকক্ষে দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি করে কেঁদে তিনি বুকের জ্বালা কমাতে চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম জীবনে মদ্যপানে তাঁর প্রচন্ড আসক্তি ছিল। কিন্তু সিংহাসনারোহণের পর তিনি মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং সভাসদদের মধ্যেও তা নিষিদ্ধ করেন। ড. হাবিবুল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন যে সুলতানের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি মানুষ বলবনকে বলি দিয়েছিলেন।

উৎসব-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বলবনের দরবারকে বিশেষভাবে সাজানো হতো। নকশি করা গালিচা, বুটিদার রেশমি পর্দা, সোনা ও রূপার পাত্র দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতো। বারাণী লিখেছেন যে উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরও মানুষ দরবারের চোখ-ধাঁধানো অলঙ্করণের বিষয় আলোচনা করতো। বিদেশী দূতরা তাঁর দরবারের জাঁকজমক দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতো। সুলতান শোভাযাত্রায় বের হলে সিস্তানী সৈনিকরা খোলা তরবারি নিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতো। শক্তি, কর্তৃত্ব ও মর্যাদার এ প্রদর্শনী ছিল রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মতবাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং এটা অবাধ্য জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার করে তাদের অনুগত করে তুলেছিল।

মোঙ্গলদের আক্রমণও বলবন ও তাঁর দরবারের মর্যাদা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সময় দিল্লি সাম্রাজ্যই ছিল একমাত্র দেশ যেটা মোঙ্গলদের হাতে ধ্বংস হয়নি– ফলে বহু দেশের শাহজাদা ও গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে দিল্লিতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এর ফলে ভারতের বাইরের দেশগুলোতে মুসলমান সংস্কৃতির রক্ষকরূপে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

সালতানাতকে সুদৃঢ় করার পদক্ষেপসমূহ

সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি করার পর বলবন দিল্লি সালতানাতের দৃঢ়ীকরণের দিকে মনোযোগ দেন। বিশ বছর স্থায়ী (১২৬৬-১২৮৬) বলবনের রাজত্বকালকে দিল্লি সালতানাতের সংহতকরণ বা দৃঢ়ীকরণের কাল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, সামরিক সংস্কার ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা ছিল এ দৃঢ়ীকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

ইলতুৎমিশের আমল থেকেই তুর্কি আমীর ও মালিকরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে চলি- শজনকে নিয়ে একটি দল গঠিত হয়েছিল যারা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। বস্তুত, এরাই ছিল সালতানাতের সবচেয়ে শক্তিশালী দল এবং সুলতান নির্বাচনে ও বিতারণে এরাই মূল ভূমিকা পালন করতো। বলবন নিজেও ছিলেন এই দলের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং তুর্কি শাসক শ্রেণীর শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর ক্ষমতা ছিল এদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশলী, তবে তিনটি ব্যাপারে তাঁরা সুলতানের বিপদের কারণও হয়ে উঠতে পারতো বলে বলবনকে এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হতো–

(ক) সুলতান ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যা তাঁর সিংহাসনারোহণের আগে বহুবার ঘটেছে;
(খ) ক্ষমতা, বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তুর্কি অভিজাতদের একাধিপত্য এবং
(গ) তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনের জন্য তাঁর পুত্রদের সঙ্গে তুর্কি অভিজাতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এসব বিপদ এড়াবার জন্য বলবন বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলো অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভারতে তুর্কি শাসনের অবসানের জন্য কিছুটা দায়ী হয়েছিল।

ফিরিশতা বলেছেন যে বলবন ইলতুৎমিশের সব বংশধরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন যাতে তাদের মধ্যে কেউ উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর বা তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে সিংহাসন দাবি করতে না পারে। শক্তিশালী তুর্কি অভিজাতদের দমন করার উদ্দেশ্যে তিনি ঘাতকের তরবারি ও বিষ, উভয়ই অবাধে ব্যবহার করেছেন। 'বন্দেগান-ই-চেহেলগানের' নেতৃস্থানীয় সদস্যদের তিনি হত্যা করেন এবং বাকীদের ক্ষমতা লোপ করেন। তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহে তিনি তাঁর আত্মীয় শের খানকেও হত্যা করেছিলেন।

মেওয়াটী দস্যুদের দমন

দেশে বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে বলবন বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে মেওয়াটী দস্যুরা নানারূপ গোলযোগ সৃষ্টি করছিল। তারা দিল্লির আশেপাশে লুটতরাজ ও দস্যুবৃত্তিতে তৎপর হয় এবং জনজীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। বারাণী মেওয়াটীদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সুস্পষ্ট ও চিত্রবৎ বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের অত্যাচারের ভয়ে দিল্লির পশ্চিম দিকের প্রধান ফটক আছরের নামাজের সময় বন্ধ করে দিতে হতো। এ সময় কেউ ভ্রমণ বা দরগাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যেও শহর থেকে বাইরে যেতে সাহস করতো না। তাদের অত্যাচারের হাত থেকে পানি বহনকারী (ভিস্তি) বা ক্রীতদাসীরা, এমন কি ফকির-সন্ন্যাসীরাও রেহাই পেতো না। বলবন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি এসব দস্যুদের আশ্রয়স্থল বন-জঙ্গল পরিষ্কার করেন। দিল্লির নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি গোপালগিরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং দিল্লির আশেপাশে বেশ কয়েকটি ফাঁড়ি নির্মাণ করে বিশ্বস্ত ও দক্ষ আফগান দলপতিদের সেখানে নিয়োগ করেন। বারাণীর ভাষ্যানুযায়ী এরপর থেকে দিল্লিতে আর কখনো মেওয়াটীদের লুটতরাজ হয়নি।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

মেওয়াটী দস্যুদের নির্মূল করার পর বলবন দোয়াবের দস্যু-দমনে মনোনিবেশ করেন। সেখানকার অবাধ্য প্রজাদের তিনি কঠোর শাস্তি দান করেন। কাম্পিল, পাতিয়ালি ও ভোজপুর ছিল দস্যুদের আশ্রয়কেন্দ্র।

রাস্তা-ঘাটে পথিক ও ব্যবসায়ীদের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তাদের দমনের উদ্দেশ্যে বলবন নিজেই কাম্পিল ও পাতিয়ালিতে গিয়ে পাঁচ-ছয় মাস অবস্থান করেন। তিনি নির্মমভাবে সেখানকার দস্যু ও বিদ্রোহীদের হত্যা করেন। ফলে রাস্তা-ঘাট আবারো পথচারী ও ব্যবসায়ীদের জন্য নিরাপদ হয়। কাম্পিল, পাতিয়ালি ও ভোজপুরে তিনি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। ষাট বছর পরেও বারাণী উল্লেখ করেছেন যে, দেশের কোথাও দস্যুদের উপদ্রব ছিল না।

এরপর বলবন কাটেহারের হিন্দু বিদ্রোহীদের দমন করেন। তাঁরা বাদাউন ও আমবোহার গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে রায়তদের ধন-সম্পদ লুট করতো। তাঁরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, এসব জায়গার ইকতাদারদের কর্তৃত্বও তারা মানতো না। বলবন নিজে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদের দমন করেন। বারাণী বলেছেন যে, বিদ্রোহীদের রক্তে কাটেহারের ভূমি লাল হয়ে গিয়েছিল, গ্রামে গ্রামে মৃতদেহের স্তুপ গড়ে উঠেছিল এবং মৃতদেহের গন্ধ গঙ্গানদী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বারাণী এও বলেছেন যে, সে সময় থেকে জালালউদ্দিনের রাজত্বকাল পর্যন্ত কাটেহারে বিদ্রোহীরা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই বলবন দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর বলবন নতুন নতুন রাজ্য জয় করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। এর কয়েকটি কারণও ছিল। বলবন ছিলেন অভিজ্ঞ ও বাস্তববাদী সুলতান। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে সালতানাতের সাংগঠনিক অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছিল। নতুন অঞ্চল জয় করলে সালতানাতের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই হিন্দু দলপতিদের বিদ্রোহ বলবনকে সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে বিরত রেখেছিল। এসব হিন্দু দলপতি সুযোগ পেলেই দিল্লির শাসনকে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কাজেই তাদের প্রতি লক্ষ রাখা ও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ছিল অধিকতর জরুরি।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ

সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে সব সময়ই মোঙ্গল-আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তাদের আক্রমণের ভয়ে বলবন প্রায় সব সময়ই দিল্লিতে অবস্থান করতে বাধ্য হন। মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে দিল্লির সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যার ফলে সেখান থেকে নতুনভাবে তুর্কিদের আগমন বাধাগ্রস্ত হলে দিল্লিতে জনবলের অভাব দেখা গিয়েছিল। তাছাড়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিও বলবনের সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মোঙ্গলদের আক্রমণের আশঙ্কাতেই বলবন নতুন রাজ্য জয়ের চেষ্টা করেননি। তিনি নিজেই বলেছেন যে, সেই পরিস্থিতিতে দিল্লি ত্যাগ করা বা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করা উচিত হবে না। সম্প্রসারণের চেয়ে সংহতকরণকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুরনো দুর্গ সংস্কার এবং বেশ কয়েকটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন। সীমান্ত এলাকায় তিনি বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেনাপতি নিয়োগ করেন। তাঁর আত্মীয় শের খান বহুদিন সীমান্তে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শের খানের মৃত্যুর পর বলবন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদকে মুলতানে ও দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে সামানা ও সুনামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করে শতদ্রু নদী পার হয়ে অগ্রসর হলে দুই ভাইয়ের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে সাময়িকভাবে মোঙ্গলদের হাত থেকে দিল্লি সালতানাত রক্ষা পায়।

সামরিক সংস্কার

বলবন উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি শক্তিশালী ও দক্ষ সেনাবাহিনী তাঁর শক্তি ও সালতানাতের নিরাপত্তার মূলস্তম্ভ। তাই তিনি সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধন করেন।

বলবন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং বহু বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি তাদের বেতনও বৃদ্ধি করেছিলেন। সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি করে তাদের সন্তুষ্ট রাখা ছিল বলবনের সামরিক ব্যবস্থার এক আবশ্যিক নীতি। সেনাবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি কখনো অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধা করেননি। সৈনিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য তিনি সবসময়ই তাদের কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করতেন। তিনি সামরিক বিভাগের প্রধানকে (আরিজ-ই-মমালিক) ওয়াজিরের আর্থিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের আমলে প্রায় দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে দোয়াবে জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে মারা গিয়েছিল বা যুদ্ধে অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। তবুও তাদের পুত্ররা কোনো সামরিক দায়িত্ব পালন না করেও সেইসব জায়গীর ভোগ করছিল। সামরিক সংস্কারের অংশ হিসেবে বলবন এসব জায়গীরদারদের জায়গীর লাভ ও ভোগের শর্তাবলী তদন্তের এবং এসব জায়গীর বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লির কোতোয়াল ও বলবনের ব্যক্তিগত বন্ধু মালিক ফখরুদ্দিনের অনুরোধে তিনি সেই আদেশ প্রত্যাহার করেন।

বলবন দৃঢ় হাতে রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে ঐক্য-নাশক প্রবণতা রোধ করেন। তিনি কেন্দ্র শাসনাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে কেন্দ্রে প্রতিবেদন পেশ করতে হতো। দক্ষ নিরীক্ষকদের মাধ্যমে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আর্থিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত তাঁর পুত্ররাও কোনো জটিল বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সুলতানের নির্দেশ মত শাসন কাজ পরিচালনা করতে বাধ্য ছিলেন।

সুলতান হওয়ার আগে সুলতানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে নায়েব-ই-মামলুকাতের মতো কিছু পদ সৃষ্টিতে বলবন নিজেই এক সময় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান হওয়ার পর কোনো কর্মচারীর হাতে যেন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এ কারণেই তিনি ওয়াজিরের হাত থেকে আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছিলেন।

বলবন উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে একটি দক্ষ ও বিশ্বস্ত গুপ্তচর ব্যবস্থা অত্যন্ড় প্রয়োজনীয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি গুপ্তচর বাহিনী সৃষ্টি করেন। এসব গুপ্তচর বিশ্বস্ততার সঙ্গে সুলতানের পুত্র, আত্মীয়, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও জনগণের কার্যকলাপ লক্ষ করতো এবং সে সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত করতো। নিয়োগের আগে গুপ্তচরদের চরিত্র, সততা, এমনকি বংশ পরিচয়ও তদন্ত করা হতো।

বলবনের শাসনামলে দিল্লি সালতানাতের বিস্তৃতি ঘটেনি, তবে তিনি সালাতানাতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। ড. হাবিবুল্লাহ্ বলেছেন যে খলজীদের বিজয়াভিযানের উপযুক্ত পরিবেশ বলবনই সৃষ্টি করেছিলেন।

তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমন

তুঘ্রিল বেগের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা বলবনের রাজত্বকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তুঘ্রিল বেগ বলবনের ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করেছিলেন। নিজের প্রতিভা ও দক্ষতার বলে তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে লখনৌতির শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। বাংলার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা দিল্লির সুলতানদের জন্য সব সময়ই ছিল একটি বড় সমস্যা। সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলার শাসনকর্তারা প্রায়ই স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, বাংলার আবহাওয়া সব কিছুই ছিল বিদ্রোহের অনুকূল। বাংলার শাসনকর্তাদের বারম্বার বিদ্রোহের কারণে বারাণী বাংলাকে

'বলঘাক্‌পুর' (বিদ্রোহীদের নগরী) নামে আখ্যায়িত করেছেন। তুঘ্রিলের অনুচরবৃন্দ তাঁকে বুঝিয়েছিল যে সুলতান এখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ, তাঁর দুই পুত্র মোঙ্গলদের দমন করতে ব্যস্ত। কাজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করার এখনই উপযুক্ত সময়। তুঘ্রিল তাদের কথায় পথভ্রষ্ট হন। তিনি জাজনগর আক্রমণ করে প্রভূত ধন-রত্ন এবং হাতি লাভ করেন। লুণ্ঠিত ধনের সুলতানের প্রাপ্য অংশ নিয়মানুযায়ী সুলতানকে না পাঠিয়ে তিনি নিজের জন্য রেখে দেন। লখনৌতির অধিবাসীদের মধ্যে প্রচুর ধন-রত্ন বিলিয়ে তিনি তাদের সমর্থন লাভ করেন। এরপর তিনি সুলতান মুগিসউদ্দিন উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা জারি ও খোৎবা পাঠ করান।

তুঘ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর পেয়ে বলবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু দিল্লি-বাহিনী তুঘ্রিলের হাতে পরাজিত হয় ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। দিল্লির অনেক আমীর ও সৈন্য দলত্যাগ করে তুঘ্রিলের বাহিনীতে যোগ দেয়। রাগে অন্ধ হয়ে বলবন আমিন খানকে মৃত্যু দন্ডাদেশ দেন। তুরবাতি খানের নেতৃত্বে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে পাঠানো দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থ হলে বলবন নিজেই বিশাল বাহিনী ও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে নিয়ে তুঘ্রিলকে দমন করার জন্য ১২৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার উদ্দেশ্য যাত্রা করেন। তুঘ্রিলকে পরাজিত না করে তিনি দিল্লিতে ফিরে আসবেন না বলেও ঘোষণা করেন। বাংলার প্রচন্ড বর্ষাও তাঁর অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। বৃদ্ধ সুলতানের সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি দেখে তুঘ্রিল ভীত হয়ে তাঁর রাজধানী ত্যাগ করে ধন-রত্ন, হাতি ও সৈন্যদল নিয়ে সোনারগাঁওয়ের দিকে পালিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুঘ্রিল বলবনের সৈন্যদের হাতে নিহত হন। এরপর তুঘ্রিলের পরিবার পরিজন, সভাসদ এবং অনুচরদের বন্দি করে লখনৌতিতে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে সকলকেই নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে শাসন সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিয়ে ও সতর্ক করে দিল্লি ফিরে আসেন। তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমন করতে বলবন প্রায় তিন বছর বাংলায় কাটিয়েছিলেন।

বলবনের মৃত্যু

দিল্লিতে ফিরে এসে বলবন আরেক বিপদের সম্মুখীন হন। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলরা পাঞ্জাব আক্রমণ করলে মুলতানের গভর্নর শাহজাদা মুহাম্মদ লাহোর ও দিপালপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে মোঙ্গলদের বাধা দেন। মোঙ্গলরা পরাজিত হলেও যুদ্ধে শাহজাদা মুহাম্মদ মোঙ্গলদের হাতে নিহত হন। ঐ যুদ্ধে আমীর খসরুও মোঙ্গলদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন, তবে কিছুদিন পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। মোঙ্গল আক্রমণের বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আমীর খসরু বলেছেন যে, মুলতানে প্রতিটি পরিবারেই কেউ না কেউ মোঙ্গলদের হাতে নিহত হয়েছিল। শাহজাদা মুহাম্মদ সুলতানের অত্যন্ত প্রিয় সন্তান ছিলেন। সুলতান তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শাহজাদা মুহাম্মদ নিজে জ্ঞানী ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বহু কবি সাহিত্যিক তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। শোকাভিভূত আমীর-ওমরাহরা শাহজাদা মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁকে খান-ই-শহীদ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শাহজাদা মুহাম্মদ মোঙ্গলদের হাতে নিহত হলে বলবন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বলবনের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই তাঁর বংশধরদের রাজত্বের অবসান ঘটে। তবে দিল্লি সালতানাতকে তিনি যে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা বহু শতাব্দী টিকে ছিল এবং সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও সাফল্য। একটি বিষয়ে অবশ্য বলবনের নীতি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়– তুর্কিদের প্রতি তাঁর আস্থা ও উচ্চবংশের প্রতি তাঁর মোহ তাঁর বংশের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন একদিকে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে মধ্য- এশিয়ার সঙ্গে দিল্লির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বিশাল সংখ্যায় তুর্কিদের ভারতে আগমন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে ধর্মান্তকরণ ও অন্তর্বিবাহের ফলে অ-তুর্কি মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ড. হাবিবুল্লাহ যেমন বলেছেন– "ক্রমশ বিভিন্ন জাতিসত্তার সমন্বয়ে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং দিল্লি সালতানাত ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে তুর্কি থেকে ভারতীয় মুসলমান

রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছিল। এ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করা শুধু যে অর্থহীন ছিল তাই নয়, এটা ছিল অত্যন্ত অবিবেচনাপূর্ণ। ধীরে ধীরে কমে আসা খাঁটি তুর্কিদের পক্ষে আধিপত্য বজায় রাখা ছিল অসম্ভব। বলবনের আপোষহীন মনোভাব একে কৃত্রিম অতিরিক্ত মেয়াদ দিয়েছিল। ফলে তাঁর মৃত্যুতে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থেকে তুর্কিদের অপসারণ ঘটে।" ড. এ.কে. নিজামীও অনুরূপ মত পোষণ করে লিখেছেন যে "বিলম্বিত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এসেছিল বিপ- বের আকারে।"

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকাল এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বিশ বছর নাসিরউদ্দিনের মন্ত্রী এবং বিশ বছর সুলতান হিসেবে বলবন দিল্লি সালতানাতের সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে এবং দেশীয় হিন্দু সামন্ত প্রভূ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মুসলমান আমীরদের দমন করে তিনি সালতানাতের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেন। অধ্যাপক আবদুল করিম গিয়াসউদ্দিন বলবনকে দিল্লি সালতানাতের পুনর্জন্মদাতারূপে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর ভাষায় : "যদিও সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী উত্তর পাক-ভারত জয় করেন, কুতুবউদ্দিন আইবক মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ ইহার স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন, ইলতুৎমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় দিল্লি সালতানতের নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং বলবনই স্বীয় সাহস, দক্ষতা ও বীরত্বের দ্বারা পুনরায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।" অধ্যাপক কে.এ. নিজামী বারাণীর সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন যে, "দুর্গ ও সামরিক ফাঁড়ি নির্মাণ করে তিনি হরিয়ানা থেকে বিহার পর্যন্ত সাম্রাজ্যের প্রধান প্রদেশগুলোতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রস্তুতিমূলক এ কাজ ছাড়া খলজী আমলের কীর্তিসমূহ ছিল অসম্ভব।"

সারসংক্ষেপ

১২৬৬ থেকে ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বৎসরকাল দিল্লির সুলতান হিসেবে গিয়াসউদ্দিন বলবন কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সিংহাসনারোহণের পর তিনি সালতানাতের সমস্যাবলী সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন। সুলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তিনি রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তুর্কি আমীর-ওমরাহ্দের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশৃঙ্খলা দূর করে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সামরিক ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শক্তি বৃদ্ধি করেন। মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি পরিহার করে সালতানাতকে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিদ্রোহ দমনেও তিনি কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। বাংলার মুসলিম শাসনকর্তা তুঘ্রিল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, তিনি নিজে আক্রমণ পরিচালনা করে বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে পরাজিত করেন এবং বাংলায় দিল্লির শাসন পুন:প্রবর্তন করেন।

বলবনের শাসনকাল মূলত: ছিল সালতানাতকে সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণের কাল। বলবনের সাফল্যই দিল্লির মুসলিম সালতানাতকে নতুন জীবন ও উদ্দীপনা দান করেছিল। এর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছিল খলজীদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গিয়াসউদ্দিন বলবন সুলতান হওয়ার আগে ছিলেন–
(ক) ইলতুৎমিশের মন্ত্রী (খ) আলাউদ্দিন খলজীর সেনাপতি
(গ) নাসিরউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রী (ঘ) মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রধানমন্ত্রী।

২। গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লির সুলতান হয়েছিলেন–
(ক) ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে।

৩। গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দিনের–
(ক) ভাই (খ) চাচা
(গ) শ্বশুর (ঘ) জামাতা।

৪। গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে বাংলায় বিদ্রোহ করেছিলেন–
(ক) ফখরুদ্দীন (খ) ইলিয়াস শাহ
(গ) গণেশ (ঘ) তুঘ্রিল বেগ।

৫। শাহজাদা মুহাম্মদ নিহত হন–
(ক) মোঙ্গলদের হাতে (খ) তুর্কি আমীরদের হাতে
(গ) মেওয়াটিদের হাতে (ঘ) আলাউদ্দিন খলজীর হাতে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বলবনের সুলতান হওয়ার আগেকার পরিচয় দিন।
২। সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বলবন কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সুলতান হিসেবে গিয়াসউদ্দিন বলবনের সমস্যাবলী এবং রাজতন্ত্র সম্পর্কে মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।
২। রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বলবনের গৃহীত ব্যবস্থাবলী আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India.*
২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*
৩। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*
৪। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারতের ইতিহাস*, ২য় খন্ড।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ১। (ক) ; ২। (গ) ; ৩। (গ) ; ৪। (খ)।
পাঠ : ২ ১। (গ) ; ২। (ক) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (ক) ; ৫। (ঘ) ; ৬। (খ)।
পাঠ : ৩ ১। (ক) ; ২। (গ) ; ৩। (খ) ; ৪। (গ) ; ৫। (ক)।
পাঠ : ৪ ১। (গ) ; ২। (ক) ; ৩। (গ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ক)।